Development Compilation
Bangladesh Institute of Professional Studies
https://bips.bd/journal
ISSN: 2072-3334 (Print), ISSN: 2663-1547 (Online)

Volume 19 | Issue 2 | October 20, 2026 | Page: 364-371 | Article |

বাংলায় ইসলাম বিস্তার : শান্তিপূর্ণ প্রচার বনাম সামরিক বিজয়-একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

The Spread of Islam in Bengal: Peaceful Preaching versus Military Conquest — A Historical Analysis

Dr. Mohammad Azibar Rahman[1] , Harunur Rashid[2]

1. Associate Professor, Department of Islamic History & Culture & Registrar, North Bengal International University, Rajshahi, Bangladesh
   Email: drazibar76@gmail.com
2. Lecturer, Islamic Studies, Tatul Sheikh College, Sarojgonj, Chuadanga, Bangladesh
   Email: haruntsc131314@gmail.com

HOW TO CITE

Rahman, M. A., & Rashid, H. (2026). The spread of Islam in Bengal: Peaceful preaching versus military conquest — A historical analysis. *Development Compilation*, *19*(2), 364–371. https://bips.bd/journal

ARTICLE HISTORY

Received: 30 July 2026
Revised: 20 August 2026
Accepted: 25 September 2026
Available online: 20 October 2026

© 2026 The Author(s). Published by **Development Compilation**, Bangladesh Institute of Professional Studies. This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CC BY 4.0

Abstract

Islam spread to Bengal through a multidimensional and long-term historical process. In this regard, the trade and commerce of Arab merchants, the activities of Sufi saints, political and military victories and state patronage played an important role. Although military victories were helpful in establishing administrative structures and political control, they were not the means of spreading Islam. However, they prepared a favorable and safe environment for the preachers of Islam. Fundamentally, peaceful propagation, humanity, social service, spiritual education, economic change, inclusive approach and adaptation to local culture were the main driving forces of the spread of Islam. This article analyzes the trend of the spread of Islam in Bengal from the seventh to the eighteenth century. Our main goal is to reconstruct the correct and objective history of the spread of Islam against the backdrop of the Muslim majority in Bengal. This article has been prepared with reference to the Qur'an, Hadith, Tafsir, relevant historical texts, and digital sources. Both Analytical and descriptive methods have been followed in its formulation.

Keywords: Bengal, Peaceful, Islam, Propagation, Military, Conquest, Analysis, Debate.

ভূমিকা (Introduction)

মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে ভয় প্রদর্শনকারী, সুসংবাদদাতা, পথপ্রদর্শক হিসেবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, মানব সমাজ পাপ ও অনাচারে উদভ্রান্ত, দিশেহারা ঠিক তখনই ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মহান আল্লাহ আরবের মক্কা নগরীর বিখ্যাত কুরাইশ বংশে মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) ছিলেন সমগ্র বিশ্বের নবী এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে নবুওয়াত লাভের পর থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও রিসালাতের মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তের বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেছেন। মক্কা জীবনে ধর্মীয় প্রধান হিসেবে ইসলাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব পালন করে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন এবং নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মদীনার সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারে নবদিগন্তের সূচনা করেন। মূলত সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুমহান বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মূল লক্ষ্য। এ জন্য তিনি সুদূরপ্রসারী ও শান্তিপূর্ণ বিভিন্ন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল বিশ্বজনীন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলাম

প্রচারকগণের আগমন ঘটে। তবে বাংলায় ইসলাম বিস্তারের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ঐতিহাসিক পর্যায় অতিক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। প্রবন্ধটিতে এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আরবের বাইরে ইসলাম

হিজরতের পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বেদুইন গোত্রের প্রতিনিধিরা মদীনায় এসে মুহম্মদ (স.)-এর শাসন কর্তৃত্বকে স্বীকার করে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ওমান, ইয়েমন ও হাজরামাউথ-এর প্রতিনিধিগণ মুহম্মদ (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। র রাসূল (সা.) নিজেও আরব ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও গোত্র প্রধানদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দিহইয়া ইবন খলীফা আল-কালবীকে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট, আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা আস-সাহমীকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট, হাতিব ইবন আবু বালতা'আহকে মিসরের শাসক মুকাওকিসের নিকট, সুলাইত ইবন আমর আল-আমেরীকে ইয়ামামার শাসক হাওযাহ ইবন আলীর নিকট, শুজা' ইবন ওয়াহাব আলআসাদীকে শামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শাসক হারিস ইবনুআবু শিমর আল-গাসসানীর নিকট এবং আলা ইবনুহাদরামীকে বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবন সাওয়ার নিকট পত্রসহ প্রেরণ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসব ঘটনার অনুকূল প্রভাব পড়তে থাকে। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পত্রের শেষে সীলমোহর ব্যবহার করা হত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আংটিতে মুদ্রিত সীলমোহরটি ছিল রৌপ্য নির্মিত, যাতে 'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' খোদিত ছিল। এতে তিনটি লাইন ছিল। এক লাইনে 'মুহাম্মাদ, এক লাইনে 'রাসূল' এবং এক লাইনে 'আল্লাহ'।' রাসূলুল্লাহ (সা.) চিঠিসহ দূত প্রেরণ করে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ, মিসরের শাসনকর্তা আযীয মিসর, হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসী, ইয়ামামার সর্দারবৃন্দ ও গাস্সানী শাসক হারিস প্রমুখের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে যদি একটি কথাও তোমাদের জানা থাকে তাহলে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।' বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (সা.) বলেন, 'যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার এ বাণী পৌঁছে দিবে।'ররারাসূল (সা.)-এর ঐ ভাষণের সময় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অথচ তাঁদের এক-দশমাংশের সমাধিও আরব ভূ-খণ্ডে পাওয়া যায় না। ধারণা করা যেতেই পারে যে, ইসলাম প্রচার করতে করতে তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁরা জন্মভূমি আরব দেশে আর ফিরে যেতে পারেননি। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে'। আল কুরআনের বাণী এবং হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম ইসলামমের সুমহান দাওয়াত নিয়ে দূর-দূরন্তে ছড়িয়ে পড়েন। বাংলায়ও তাঁদের আগমন ঘটেছিল নিশ্চয়ই। এভাবে আরব বণিকদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে।

ইসলাম আগমনের পূর্বে বাংলার অবস্থা

আরব বণিকদের আগমনের পূর্বে বাংলার সমাজব্যবস্থা ছিল মূলত হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম ভিত্তিক এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত। বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দুধর্মের দেব-দেবী ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন জনপদ নিয়ে গঠিত বাংলায় তখন বিভিন্ন কুপ্রথা চালু ছিল। অমানবিক জাতিভেদ প্রথা ছিল। ধর্ম সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে সর্বদা হানাহানি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান থাকায় জনসাধারণ নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরিস্থিতিতে নবাগত মুসলমানদের আচার-আচরণ ও চারিত্রিক গুণাবলী স্থানীয়দের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে।ররর বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের একটি সহাবস্থান ছিল। জাতিভেদ প্রথা তীব্র ছিল, যা মানুষকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিল। সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে থাকত এবং তারা পূজা-পার্বণ ও সামাজিক আইন নিয়ন্ত্রন করত। নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থা ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। আরব বণিকদের আগমনের অনেক আগে চট্টগ্রাম ও মেঘনা অববাহিকা দিয়ে বঙ্গোপসাগর উপকূলের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সাথে দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কারিগররা বিভিন্ন পণ্য, যেমন- চন্দন কাঠ, মসলা, সূতী কাপড় ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করত। শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণ-কেন্দ্রিক। বাংলার সমাজ ছিল একটি ঐতিহ্যবাহী, কৃষিনির্ভর এবং বর্ণপ্রথাযুক্ত। সমাজে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির মিশ্রণ বিদ্যমান ছিল। বর্ণপ্রথা ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে সাধারণ মানুষ নির্যাতনের শিকার হত। সামাজে নারীদের অধিকার ছিল সীমিত। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সামন্ততান্ত্রিক শাসন বিদ্যমান ছিল। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজারা সামন্ত প্রভুদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করত।

বাংলায় ইসলাম বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায় (সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী)

বাংলায় মুসলিম আগমনের সূচনা হয় মূলত সপ্তম শতকে আরব বণিকদের মাধ্যমে। সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরব বণিকরা বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন করেন। আরব বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলায় এসে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বণিকদের মানবিক আচরণ, সাম্য ও উদার নীতিতে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত 'হিন্দ' তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর দরবারে আলোচনা হয়। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীগণকে ভারবর্ষে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। একটি দল হিন্দুস্থানে যুদ্ধ করবে আর দ্বিতীয় দল ঈসা ইবনু মরিয়মের সাথে থাকবে। হাদীসটির প্রতিক্রিয়ায় আবুহুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে 'হিন্দ' বিজয়ের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। সেই সময় যদি আমি জীবিত থাকি, তাহলে আবশ্যই আমার ধনসম্পদ ও জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হব না। ঐ যুদ্ধে আমি নিহত হলে শ্রেষ্ঠ শহীদের মর্যাদা পাব আর মঙ্গল মত ফিরে এলে জাহান্নাম

থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব। রাসূল (সা.)-এর হাদীস ও প্রখ্যাত সাহাবী আবু হোরায়রা (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া সাহাবীগণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তাঁরা ভারতবর্ষে আগমনের সম্ভাব্য উপায় খুঁজতে থাকেন। মূলত বাংলায় নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছেছিল। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা যায়-'মুস্তাদরাকে হাকেম' হাদীস গ্রন্থে (৪/১৩৫ পৃ.) সংকলিত বর্ণনা মতে, বাংলার শাসক রাহমী বংশের রাজা শেষ নবীর আগমনের সংবাদে খুশী হয়ে আরব বণিকগণের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর দরবারে এক কলসি আদা উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) তা সানন্দে গ্রহণ করত নিজে খেয়েছিলেন এবং টুকরো টুকরো করে কেটে সাহাবাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।

ইসলাম বিস্তারের উপায়

বাংলায় ইসলাম বিস্তারের উপায়কে প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-নৌপথ ও স্থলপথ। আবার এই উভয় পন্থা ব্যবহারকারী ইসলামের ধারক বাহকগণকেও দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথাএক. মুসলিম ব্যবসায়ী দল- যাঁরা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বাংলায় আগমন করলেও ধর্ম প্রচারের মহান দায়িত্বও পালন করেছেন। দুই. মুসলিম সেনাবাহিনী তথা অভিযাত্রীদল- যাঁরা দেশ জয়ের সাথে সাথে মানুষের হৃদয়ও জয় করতে পেরেছিলেন এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মহিমায় বিজিত অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম যুগের মুসলিমগণ প্রচারক, বণিক বা সৈনিক যাই হোন না কেন, তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম প্রচার মূলত ইসলামেরই এক মৌলিক শিক্ষা। তাই তাঁরা ইসলাম প্রচার-প্রসারের জন্য পর্যায়ক্রমে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের বিচারে ইসলাম ধর্ম প্রচারই ছিল জান্নাত লাভের চাবিকাঠি। তাই যেখানে তাঁরা গেছেন সেখানেই ইসলাম প্রচার করেছেন। মূলত আরব মুসলমানদের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

সমুদ্রপথে আরব বণিকদের আগমন ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ

ভারতবর্ষ ব্যাপী বহু সংখ্যক নৌযান চলাচলের উপযোগী নদী রয়েছে। আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে যাতায়াত করতেন। বাংলার দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা, মিহি সূতী কাপড়, রেশমী বস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যেতেন। গরম মশলা উৎপন্ন হত প্রধানত সরন্দ্বীপ (সিংহল) ও তার নিকটবর্তী ভারতের দক্ষিণ এলাকায়। অন্যদিকে গজদন্তের জন্য বাংলার উপর নির্ভর করতে হত। কারণ গজদন্ত বা হাতীর দাঁতের জন্য বাংলা প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত ছিল। সপ্তম শতাব্দী থেকে পূর্বাঞ্চলের সাথে বিশেষ করে চীনের সাথে আরবীয় মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌপথে আরব বণিকদের অবাধ বিচরণ ছিল। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।'কাজেই বলা যায়, সপ্তম শতকে অর্থাৎ হিজরী প্রথম শতকের শুরুতেই আরব বণিকদের জাহাজ বাংলার উপকূলীয় বন্দরসমূহে নোঙর করেছে। মূলত প্রাগৈতিহাসিককাল থেকেই আরবরা তাঁদের আদি পিতার নামের স্থান ভারতবর্ষে যাতায়াত করত। এমনকি ভারতবর্ষের আদি নামটি পর্যন্ত আরবদের দেওয়া। আরবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর মোজেজা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।একদিন গুজরাটের রাজা ভোজ তাঁর ইমারতের ছাদে উঠে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য দেখতে পান। এ রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠান। তাঁরা যোগসাধনা করে বলেন, আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর ধর্মের সত্যতা প্রমাণের জন্য আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছেন। তখন রাজা মুহাম্মাদ (সা.)-এঁর কাছে দূত পাঠান এবং সাথে পত্র লেখেন- 'হে মহামান্য! আপনার এমন একজন প্রতিনিধি আমাদের দেশে পাঠান, যিনি আমাদেরকে আপনার সত্য ধর্ম শিক্ষা দিতে পারেন।'রাসূল (সা.) তাঁর জনৈক সাহাবীকে 'হিন্দ' তথা ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। তিনি রাজা ভোজকে ইসলাম ধর্মে বায়'আত করান এবং নাম রাখেন আব্দুল্লাহ। সাহাবী ও আব্দুল্লাহর মাযার গুজরাটের দারদা শহরেই রয়েছে।

মালাবার-বাংলা-চীন নৌপথে ইসলামের প্রসার

আরব বণিকগণ মালাবারের পথ ধরেই বাংলা ও আসাম হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিল মধ্য পথের প্রধান বন্দর। লাবারকে আরবরা 'মাবার' বলতেন। এর অর্থ অতিক্রম করে যাওয়ার স্থান, পারঘাট। বণিকগণ এই ঘাট পার হয়েই মাদ্রাজ ও হেজায প্রদেশে গমন করতেন। মিশর হতে চীন ও পথিপার্শ্বস্থ অন্যান্য নগর-বন্দরে যাতায়াত করতেন। এই জন্য তারা এই দেশকে মাবার বলতেন।'এই নাম দু'টি হতেও জানা যায় যে, এ অঞ্চলের সাথে তাদের পরিচয় অতি পুরাতন এবং সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বণিকদের ভাষা ছিল আরবী। বস্তুত আরব বণিকরাই ছিলেন হিজরী সপ্তম শতক পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের প্রধান উদ্যোগী ও সদা সক্রিয় উপলক্ষ। এই উৎসাহী ও ধর্মপ্রাণ প্রচারকগণের সংশ্রবে আসার ফলেই মালাবারের জনগণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় খুব সম্ভব হিজরী সনের প্রথমদিকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মালাবারের রাজার ইসলাম গ্রহণের পরই সেখানকার অনারব অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রসার শুরু হয়।'আরব বণিকগণ জাহাজ নিয়ে মালাবার আগমন করেন এবং তাঁদের প্রভাবে রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর মক্কায় গিয়ে কিছুকাল নবী করীম (সা.)-এর সান্নিধ্যে থাকেন।। রাজা চেরুমল ও তাঁর অনুগামী সহযাত্রীগণ ছাড়াও ভারতবর্ষ থেকে আরো কিছু সংখ্যক মানুষ মহানবী (সা.)-এর নিকট গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। পশ্চিমে মিসর এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্র পথে চলাচলকারী নৌবহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করত। রাসূল (সা.) গুরুত্বপূর্ণ এই বাণিজ্য কেন্দ্রটি পূর্ণমাত্রায় খবর আদান প্রদানের জন্য ব্যবহার করতেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে কায়েস ইবন হুযাইফা (রা.), উরওয়াহ ইবনু আছাছ (রা.), আবূ কায়েস ইবনু হারিস (রা.) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী

মুসলিম দু'টি জাহাজ নিয়ে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন। চীনে যাওয়ার পথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের জাহাজ বাংলার বন্দরগুলোতেও নোঙর করতে হয়েছে। ফলে স্থানীয় মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে। এই সুযোগে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী স্থানীয়দের মাঝে প্রচার করেছেন। এতে বাংলার কিছু মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণের করেছেন। ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারক একটি দল অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রাসূল (সা.)-এর মামা সম্পর্কীয় আত্মীয় আবূ ওয়াক্কাস (রা.)। তাঁর সাথে রাসূল (সা.)-এর আরো তিনজন সাহাবী ছিলেন। আবূ ওয়াক্কাস (রা.) চীনের ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তিনি নামাজ আদায় ও ইসলাম প্রচারের জন্য ক্যান্টন বন্দরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা কোয়াংটা মসজিদটি নামে পরিচিত। মসজিদ সংলগ্ন সুউচ্চ মিনারটি সমুদ্র তীরে আজও দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর প্রায় চৌদ্দ'শ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান রূপে পরিচিত। দু'জন সাহাবীর কবর রয়েছে চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের উপর।রা চীনা মুসলমানদের বই পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর জামা'আত হিজরী তৃতীয় সনে চীনে পৌঁছান। এতে বোঝা যায়, তাঁরা হাবশা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতি করেছেন। আর এ নয় বছরে ইসলামের বাণী বাংলা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছে গেছে।

চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় বাংলায় ইসলামের বিস্তার

পর্তুগীজ নাবিক ও অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা (১৪৬০/১৪৬৯-১৫২৪) ১৪৯৮ সালে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছার পূর্বে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যকার স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে আরব ও মুসলিম বণিকদের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রভাব ছিল। ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় আরব সাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় পথের সঙ্গে ভারত, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের বন্দরগুলোর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। আরব বণিক ও নাবিকেরা এ বিস্তৃত বাণিজ্য নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে বিভিন্ন বন্দরে যাতায়াত ও বাণিজ্যিক বসতি স্থাপন করেছিলেন। ইসলামী বিশ্বের ভূগোলচর্চা ও ভ্রমণসাহিত্যে হিজরি প্রথম শতক থেকে পরবর্তী মধ্যযুগ পর্যন্ত বহু মুসলিম ভূগোলবিদ, নাবিক ও পর্যটকের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁদের রচনায় বিভিন্ন অঞ্চল, বন্দর, বাণিজ্যপথ, পণ্য, জনগোষ্ঠী ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যক্ষ বা সংগৃহীত বিবরণ সংরক্ষিত হয়েছে। কামরূপ থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ নদীপথে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে আনীত হত। ইবনু খুরদাদবিহ (৮২০/৮২৫-৯১৩), আল ইদ্রিসি (১১০০-১১৬৫), আল মাসুদী (৮৯৬-৯৫৬) প্রমুখ ভূগোলবিদের প্রদত্ত সমুদ্র বন্দরের বর্ণনা সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমন্দর চট্টগ্রামের একটি বন্দর ।। সুতরাং সমন্দর ও চট্টগ্রাম অভিন্ন। চট্টগ্রামের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। এমনকি চাটগাঁ নামটিও তাঁদের দেয়া। অষ্টম শতাব্দীর গোঁড়ার দিকেও আরব বণিকরা চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচার করেন। এমনকি অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরব বণিক ও ব্যবসায়ীদের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে স্থানীয় লোকজন দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ সময় আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে বহু পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক স্বদেশ ত্যাগ করে বাংলায় প্রবেশ করেন। তাঁরাও ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেন ।ার মূলত চট্টগ্রাম ছিল ইসলামের এন্ট্রি জোন (বহঃঙু ড়হব)। আরব বণিক ও সুফি-সাধকদের প্রথম আগমনের স্থান হিসেবে চট্টগ্রামকে বাবুল ইসলাম বা ইসলামের প্রবেশদ্বার (Gateway of Islam) বলা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে (৬৩২-৬৬১ খ্রী.)ও আরবভূমি থেকে বণিকগণ বাংলায় আগমন করেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, আদর্শ ও উত্তম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বাংলার অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিরাট বিরাট এলাকা ইসলামের আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। ইসলামের অনুসারী ও সমর্থক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়। উমর (রা.) (৬৩৪-৬৪৪ খ্রী.)-এর খিলাফতকালে কয়েকবার ইসলাম প্রচারক দল বাংলায় আগমন করেন। এঁদের নেতা ছিলেন আবদুল মা'বুদ (রা.) ও আবদুল মুহায়মিন (রা.)। এরপর হামেদ উদ্দীন (রা.), হোসেন উদ্দীন (রা.), মর্তুজা (রা.), আব্দুল্লাহ (রা.) ও আবূ তালিব (রা.) প্রমুখ আসেন। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইব্ন ইতবান (রা.), আসিম ইব্ন আল-'আবদী (রা.), সূহার ইব্ন আল-'আবদী (রা.), সুহায়ল ইব্ন আদী (রা.) ও হাকাম ইব্ন আবীল আস সাকাফী (রা.) প্রমুখ আগমন করেন। এরকম পাঁচটি দল পরপর বাংলায় আসেন। সত্যিকার মুসলিম তৈরি করাই ছিল তাঁদের আসল লক্ষ্য। পরবর্তীতে আরো পাঁচটি দল মিশর ও পারস্য থেকে বাংলায় এসেছিলেন। এঁদেরকে বলা হত আবিদ। তাঁরা বিভিন্ন প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন। অন্যদিকে উসমান (রা.)- এর শাসনামলে (২৪-৩৬হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রী.) উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার আত্তামীমী (রা.) ও আবদুর রহমান ইবন সামুরা আল বসরী (রা.) নামক দু'জন সাহাবী ভারতবর্ষে আগমন করেন।

স্থলপথে মুসলিমদের আগমন ও ইসলাম প্রচার

জলপথের পাশাপাশি স্থলপথেও বণিক ও বাণিজ্য কাফেলা ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করতেন। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান ও ইরান থেকে আগত এসব বণিক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খাইবার, বোলান ও অন্যান্য গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করতেন। পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান, কাবুল ও কান্দাহার ছিল এ স্থলবাণিজ্যপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র; পরবর্তী পর্যায়ে এসব পথ উত্তর ভারত ও গঙ্গা অববাহিকার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগকে সুদৃঢ় করে। উমার (রা.) সাহাবী উতবা ইবন গাযওয়ানকে ১৪ হিজরী মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উবুল্লার উপর সৈন্যাভিযানের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'ইসলামের আধিপত্য 'আরযুল হিন্দ' এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরযুল হিন্দ বলতে উমার (রা.) সম্ভবত উবুল্লাকে বুঝিয়েছেন। কেননা সেসময় একে 'আল-হিন্দ' বলা হত। ফলে ভারত অভিমুখে আরবদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে এবং ২৩ হিজরী মোতাবেক ৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তারা সিন্ধু উপত্যাকায় পৌঁছে যান। উসমান ইব্ন আবূল আবী সাকাফী, তাঁর ভাই মুগীরা সাকাফী, হারেস ইব্ন মুররা আবদী প্রমুখ সেনাপতি বহুবার সিন্ধু সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেন। ভারতবর্ষে সর্বশেষ আগমনকারী সাহাবী ছিলেন সিনান ইবনু সালামা মুহাব্বিক হুযালী (৮-৫৩

হিঃ/৬২৯-৬৭৩ খ্রী.), যিনি আমীর মু'আবিয়া (রা.) (৬৬১-৬৭৩ খ্রী.)-এর সময় আগমন করেন এবং ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাথমিক মুসলিম উপস্থিতির প্রমাণ

বৃহত্তর রংপুর জেলার তিস্তা নদীর অদূরে লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলাধীন পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নে মজদের আড়া গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে একটি সুপ্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। জঙ্গলের মালিক জনাব নবাব আলী প্রয়োজনের তাগিদে জঙ্গল পরিস্কার করা আরম্ভ করেন। জঙ্গলের ভিতর ৯/১০ ফুট উঁচু মাটির স্তুপ সরাতে গিয়ে তিনি একটি প্রাচীন প্রাসাদের অস্তিত্ব খুঁজে পান। ইটের নমুনা ধরে মাটি খুড়তে গিয়ে ৫৫ ইঞ্চি পুরো দালানের ভিত বেরিয়ে আসে। স্পষ্টাক্ষরে আরবী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি দেখা যায়, যাতে লেখা রয়েছে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-হিজরী সন ৬৯'। খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) নির্মিত এ মসজিদটি এযাবৎ প্রাপ্ত মসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির অন্যতম। এতে প্রমাণিত হয়, হিজরী ৬৯ সন কিংবা তার আগেই এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকগণ আগমন করেন এবং তাঁদের হাতেই মসজিদটি নির্মিত হয়।

স্থানীয় জনগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ক্রমে ভারতবর্ষে মুসিলম শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ধর্ম প্রচারকদের ক্রমাগত প্রচারাভিযান সেই ক্ষেত্রকে আরো প্রস্তুত করে তোলে। এ ব্যাপারে মুসলিম রাজন্যবর্গের চেয়ে ইসলাম প্রচারকদের অবদান বেশি। তরবারীর চেয়ে ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষের আকর্ষণবোধই বেশি কাজ করেছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁদের চরিত্র ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বদ্ধ করেন। কালিকটের রাজা জামেরীনের ইসলাম গ্রহণপূর্বক নিজে দা'ওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করা, আরাকানের রাজা বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত বাণিজ্যতরীর মুসলিম বণিকদের ধর্মবিশ্বাসে মুগ্ধ হওয়া এবং তাদেরকে নিজ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা সেই ইঙ্গিত বহন করে।তাছাড়া মুসলিম প্রচারকগণ বাংলায় এসে স্থানীয়দের সাথে একান্তভাবে মিশে যান। ঘনিষ্ঠ মেলামেশার মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে ইসলামের পবিত্র বাণী, আখলাক ও দৈনন্দিন জীবন বিধানের দা'ওয়াত শিক্ষা দেন। তাঁরা সাধারণত কোন গ্রাম বা নগরকে নিজেদের কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নিয়ে সেখানে প্রচারকেন্দ্র গড়ে তোলেন। বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশকে তাঁরা এত আপন করে নিয়েছিলেন যে, অনেকে নিজ জন্মভূমিতে আর ফিরে যাননি বরং বাংলার বুকেই সমাধিস্থ হন।

আব্বাসীয় শাসনামলে (৭৫০-১২৫৮) বাংলায় ইসলাম বিস্তারের গতি ত্বরান্বিত হয়। রাজশাহী বিভাগের বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাল রাজা ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহার থেকে আব্বাসীয় খলিফা হারুন আল-রশীদের আমলের (১৭০-১৯৪ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রী.) একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাটি ১৭২ হিজরি সন মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদিয়া টাকশাল হতে মুদ্রিত হয়েছিল। এই আবিষ্কার অষ্টম শতকের শেষভাগে বাংলার সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের বাণিজ্যিক ও যোগাযোগের সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এসময় বাংলায় বৌদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের (৭৭০-৮১০) শাসন চলছিল। আরাকানের রাজা মহত ইঙ্গত চন্দয়ত ও ধর্মপাল সমসাময়িক ছিলেন। বলা যায়, আরব বণিকরাই এই মুদ্রা নিয়ে আসেন এবং তা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হস্তগত হয়।

অন্যদিকে কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে খনন কার্য়ের ফলেও কিছু আরবীয় মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছে। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের রাজত্বের (৮১০-৮৪৫ খ্রি.) পর ময়নামতিতে শক্তিশালী দেব বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করেন। আরাকানের রামহী দ্বীপে আরবীয় মুসলিম বণিকদের জাহাজ ভাঙ্গার ঘটনার সাথে এ মুদ্রাগুলোর সম্পর্ক থাকতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যেতে পারে যে, মুদ্রাগুলো উল্লিখিত সময়েই অর্থাৎ ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় নীত হয়েছিল। আর রামহী দ্বীপে জাহাজ ভাঙার ঘটনাটিও ঘটে ৭৮৮ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। জাহাজের যারা জীবিত ছিলেন তারা রাহমী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকানের রাজার সাথে সাক্ষাত করে সেখানে বসবাসের সুযোগ লাভ করেন। আরব বণিকদল বাংলার বৃহত্তর নদী গঙ্গার উপকূল বেয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। সম্ভবত তাঁদের মাধ্যমেই পাহাড়পুরের সোমপুর বৌদ্ধ বিহারে এ মুদ্রাটি আমদানি হয়।[র] বণিকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ধর্মালোচনা ও ধর্ম প্রচারার্থে তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় কেন্দ্র পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার ও ময়নামতির শালবন বিহারে গিয়ে থাকবেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই এ মুদ্রাগুলো সংশ্লিষ্ট বৌদ্ধ বিহারে আমদানি হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। অষ্টম শতকের শেষভাগ এবং নবম শতকের প্রথম ভাগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী আরব মুসলিম শাসিত এক বা একাধিক রাজ্যের সাথে পাল শাসিত বাংলার যোগাযোগ ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবদের বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি একদিকে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তারে এবং অন্যদিকে ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়। তাই প্রথম যুগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরবীয় মুসলিম বণিকদের আগমন ও ইসলাম প্রচার বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা

উমাইয়া খলীফা প্রথম ওয়ালীদ (৭০৫-৭১৫ খ্রী.)-এর শাসনামলে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের (৯৩/৭১২-৯৬/৭১৫ খ্রি.) নেতৃত্বে মুসলিম দল ভারতের সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চল জয় করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে ইসলাম বিস্তারের সূচনা করেন। তিনি প্রথমে ভারতের সিন্ধুতে বিজয়ীবেশে আগমন করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসে বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তাঁর বিজয় শুধুমাত্র সিন্ধু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। 'মুহাম্মদ ইবন কাসিম যে নগর জয় করতেন সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। তিনি দেবল (করাচী) জয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন, মুসলমানদেরকে জায়গীর প্রদান করেন এবং চারহাজার মুসলমানের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

সিন্ধু বিজিত হওয়ার পর ইসলামী জ্ঞান গরিমায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি আরব ভূখণ্ড থেকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আগমন করেন। তাঁরা এদেশে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন। তাছাড়া বিজেতা হিসেবে মুহাম্মদ বিন কাসিম-এর সহযাত্রী হয়ে কিছুসংখ্যক উচ্চত শিক্ষিত পণ্ডিত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির বাংলায় এসেছিলেন। তাঁরা সৈনিকের পাশাপাশি ইসলামের প্রচারণা ও ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন পাঠকারী এবং ব্যাখ্যাদাতা। হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ (৬৬১-৭১৪) তাঁদেরকে কুরআন পাঠ সহজীকরণের মহৎ কাজে ব্যাপৃত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারার প্রথম পর্যায় এ সময় হতে গণ্য করা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী)

সুলতান মাহমূদ গযনবী (৯৯৭-১০৩০ খ্রী.)-এর সতেরো বার অভিযান ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংস্পর্শের দ্বিতীয় পর্যায় বিবেচনা করা হয়। পরে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভারতের পূর্বদিকে কনৌজ এবং দক্ষিণ দিকে গুজরাটের সোমনাথ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের অভিযান পরিচালিত হওয়ার ফলে এসব অঞ্চলের জনগণ মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবনধারার সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পায়। এ পর্যায়ে আরব, পারস্য, ইয়েমেন ও মধ্যএশিয়া থেকে বহু সুফি-সাধক বাংলায় আগমন করেন। এঁদের মধ্যে শাহ সুলতান বখলি, শাহ সুলতান রুমি, বাবা আদম শহিদ প্রমুখের নাম বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের সুফী সাধকদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ (রহ.) (মৃ. ১১৭৯ খ্রী.) ছিলেন অন্যতম। তিনি রাজা বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯ খ্রী.)-এর রাজত্বকালে বাংলায় আগমন করেন।রী তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, যথারীতি একটি ছোট খাট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলায় আস্তানা গেড়েছিলেন। বাবা আদম শহীদ (রহ.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণকারী মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে রাজা বল্লাল সেনের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ হন। বল্লাল সেনের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে বাবা আদম শহীদের মাজার অবস্থিত। তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ্ সুলতান বলখী (রহ.)ও এই স্তরে বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর আসল নাম মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ মাহী সাওয়ার। তিনি ৪৩৯ হিজরী মোতাবেক ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু পূর্বে বাংলায় আগমন করেনী বহু স্থানে ইসলাম প্রচার-প্রসার কল্পে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ এবং ঢাকা জেলার হরিরামপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারে তাঁর খ্যাতি সবচেয়ে বেশি। হরিরামপুরের বহু লোক তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থান বা মস্তান গড়ে যান এবং ইসলাম প্রচার করেন। এক পর্যায়ে রাজা পরশু রামের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করেন। এ সময় বহু লোক তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহাস্থান প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের রাজধানী। তখন এর নাম ছিল পৌন্ড্রনগর। তিনি মহাস্থানে একটি মসজিদ ও আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে প্রচার কার্য জোরদার করেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই মহাস্থানে শাহ্ সুলতান বল্‌খী মাহীসাওয়ারের মাযার অবস্থিত। শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী কোচ রাজার আমলে ১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা জেলার মদনপুরে আগমন করলে রাজাসহ স্থানীয় বহু লোক তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষদিকে জালালুদ্দীন তাবরিযী বাংলায় ইসলাম প্রচার করেন। পাবনার শাহজাদপুরের মখদূম দৌলা শহীদ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীর পূর্বে সেখানে এসেছিলেন বলে ধারনা করা হয়।। তাঁরা মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। রাজনৈতিক ও সামরিক অভিযানের পূর্বে বাংলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক মুসলমান হয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, একটি রাজ্য বিনা প্রতিরোধে জয় করার পিছনে অবশ্যই কিছু কারণ নিহিত রয়েছে। আশানুরূপ সংখ্যক মুসলমান ও সমর্থক সামরিক অভিযানের পূর্বে তৈরি হয়েছিল বিধায় নির্বিঘ্নে বাংলা বিজয় সম্ভব হয়েছিল। শুধু পেশীশক্তি কিংবা অস্ত্র দিয়ে কোন জাতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব নয়; বরং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা টিকে থাকায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলায় এমন একটি মুসলিম পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যখন শুধু রাজনৈতিক বিজয় অর্জন ও ক্ষমতা গ্রহণ অবশিষ্ট ছিল।

তৃতীয় পর্যায় (দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

ঘুর বংশীয় মুইযউদ্দীন মুহাম্মদ ইবন সাম (১১৪৯-১২০৬) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রি.) চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এসময় থেকে ভারতবর্ষে মুসলিম আগমনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। সুলতান আলাউদ্দীন শাহ্ খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.)-এর সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলিম শাসনের আওতাভূক্ত হয় ীর মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতে তাদের স্থায়ী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা ইতিপূর্বে অন্য কোন জাতির ছিল না ীরর ভারতবর্ষে সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়ের প্রায় ৪৯২ বছর পর কুতুবুদ্দীন আইবেকের নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীররর ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে লাখনাবতীতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করে বাংলায় স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন ীরা প্রকৃতপক্ষে বখতিয়ারই ছিলেন বাংলায় মুসলিম শাসনের স্থপতি। তিনি নদীয়া দখলের কয়েকদিন পর গৌড় বা লক্ষণাবতী আসেন। উল্লেখ্য যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর গৌড় রাজ্য প্রধানতঃ 'লক্ষণাবতী' বা লাখনৌতি নামে আখ্যায়িত হয়। ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কি শাসনামলে বাংলায় ইসলামের বিস্তার ঘটে। স্বাধীন সুলতানী আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.) বাংলা ব্যাপকভাবে ইসলামের বিস্তার ঘটে। এ সময় বহু সুফী-দরবেশ বাংলায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সুলতানরাও তাঁদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বাধীন সুলতানগণ ইসলাম বিস্তারে প্রচারকদের সহায়তা করেন। শাহজালাল (রহ.) (১২৭১- ১৩৪১), শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) (১২১৬-১৩১৩), খানজাহান আলী (রহ.) (১৩৬৯-১৪৫৯) সহ বহু সুফি-সাধক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার ঘটান। আরব, ইয়ামন, ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারত থেকে সূফী সাধকগণ বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাসে তাঁরা এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। বাংলার সমুদ্রপথ তাদের নিকটে সুপরিচিত থাকা এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠাই ছিল এর অন্যতম কারণ। মুঘল শাসনামলে (১৫৭৬-১৭৫৭/১৭৬৫) বাংলার বিশেষত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ইসলামের বিস্তার ও মুসলিম জনবসতির সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানির পরাজয়ের পর বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। এ সময় সুফি-সাধকদের উদারনীতি, সাম্যের বানী, বাংলার নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলে নতুন কৃষি জমি চাষাবাদের মাধ্যমে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার ইসলাম বিস্তারের ধারা মূলত মুসলিম বণিক, সুফি-সাধক এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ঘটেছিল।

ইসলামের নীতিগত দৃষ্টিকোন

পবিত্র কুরআন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, উত্তম উপদেশ এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আলোচনা করার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।'একই সঙ্গে কুরআনে ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে– 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই ীা মহানবী (সা.)-এর মক্কা ও মদীনা জীবনের দাওয়াতের পদ্ধতিতেও যুক্তি, নৈতিক আদর্শ, সহনশীলতা, চুক্তি ও সামাজিক সম্পৃক্ততার গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধগুলোকে সরাসরি ধর্মান্তরের উপায় হিসেবে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। কুরআনে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নিপীড়ন প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে ীার সুতরাং বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে ইসলাম বিস্তারের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পর্কিত বলা গেলেও, সেটিকে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক ধর্মান্তরের সরাসরি ও একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা ইসলামী দাওয়াহ-নীতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ, মুসলিম বণিক, সুফি-সাধকদের প্রচারনা ও আলেমদের যোগাযোগ এবং মুসলিম শাসনামলে গড়ে ওঠা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ–এসবের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্য দিয়েই বাংলায় ইসলাম ধীরে ধীরে সামাজিক ভিত্তি লাভ করেছে।

শান্তিপূর্ণ প্রচার বনাম সামরিক বিজয় শিরোনামের যৌক্তিকতা

বাংলায় ইসলাম বিস্তারের ইতিহাসে 'শান্তিপূর্ণ প্রচার বনাম সামরিক বিজয়'–এই বিতর্কটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। একদিকে, আরব বণিক সুফি-সাধক, আলেম ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে ইসলামের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও মানবিক আদর্শ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারিত হয় এবং ধীরে ধীরে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। বিশেষত মসজিদ, খানকাহ ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামাজিকসাংস্কৃতিক যোগাযোগ ইসলাম বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা, মুসলিম বসতি স্থাপন এবং মসজিদ-মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সামরিক বিজয়কে সরাসরি ধর্মান্তরের কারণ হিসেবে বিবেচনা না করলেও, ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বিস্তারের জন্য অনুকূল রাজনৈতিক কাঠামো তৈরিতে এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে বাংলায় ইসলামায়নের জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়াকে কেবল শান্তিপূর্ণ ধর্মপ্রচার অথবা সামরিক বিজয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বরং বাণিজ্যিক যোগাযোগ, আরব বণিক, সুফি-সাধকদের-প্রচারনা, মুসলিম অভিবাসন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, কৃষি ও নতুন বসতি সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন–এসব উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বাংলায় ইসলামের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় কৃষি সম্প্রসারণ ও নতুন জনপদ গড়ে ওঠার সঙ্গে মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নেতৃত্বের বিকাশ ইসলামায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। সুতরাং বাংলায় ইসলাম বিস্তারকে কেবল ধর্মপ্রচারকদের শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা কিংবা 'তলোয়ারের মাধ্যমে' সংঘটিত কোনো আকস্মিক ঘটনার ফল হিসেবে না দেখে, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্মিলিত ও ক্রমবিকাশমান ফল হিসেবে মূল্যায়ন করাই অধিকতর ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত।

উপসংহার (Conclusion)

সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় বাংলায় ইসলামের বিস্তার ঘটেছে। প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব বণিকদের আগমন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচারণা। অন্যদিকে কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিছক ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বহু সাহাবী বাংলায় আগমন; তাঁদের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশে থেকে সুফি-সাধকগণ পর্যায়ক্রমে বাংলায় এসে স্থানীয়দের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া; শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম বিস্তারে আত্মনিয়োগ এবং পরবর্তীতে সামরিক বিজয় ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ইসলাম প্রচারকদের কাজকে সহজ করে দেয়। একই সাথে বাংলার বিভিন্ন জনপদে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা বা আবাসন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামের ভিতকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করায়। সুতরাং বলা যায়, বাংলায় ইসলাম বিস্তার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার পেছনে শান্তিপূর্ণ প্রচার ও সামরিক বিজয় উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তথ্যসূত্র

মুহম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী, তারীখ আত-তাবারী, ৯ম খণ্ড, অনুবাদ: ইসমাইল কে. পুনাওয়ালার (ওৎসধরষ ক. চড়ড়হধষিষধ) (আলবানী: স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক প্রেস, ১৯৯০), পৃ. ৬২-৮১, ১০৩-১১৭।

ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম (রিয়াদ: মাকতাবা দারুস সালাম, ১৯৯৩), পৃ. ৪৬২।

এ.এম.কায়েস চৌধুরী, 'বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার', মাসিক মদীনা (ঢাকা: মদীনা ভবন ৩৮/২ বাংলা বাজার, মে, ১৯৯৪), পৃ. ১২।

ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, 'বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও সমাজ বিন্যাসের ধারা', ইসলামী গবেষণা পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, মার্চ, (রাজশাহী: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ইসলামিক রিচার্স, ২০০০), পৃ. ২৩।

Dr. A.H. Dani, Early Muslim Contact with Bengal (Pakistan: Proceedings of the Pakistan Historical Conference, 1951), p. 195.

নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার (যশোর: সীমান্ত প্রকাশনী, নভেম্বর, ১৯৯২), পৃ. ৩৭।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঃ ধারা ও প্রকৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯।

বাংলাদেশে ইসলাম, তৃতীয় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

আসকার ইবনে শাইখ, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪), পৃ. ২৩৪।

চট্টগ্রামে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১-৭২।

'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আলিমগণের অবদান', প্রাগুক্ত, পৃ.৯।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান, মুহাম্মদ আবূ তালিব সম্পা., ঢাকা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ১।

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি (জন্ম: আনু. ১১৫০ খ্রি.; মৃত্যু: ১২০৬ খ্রি./৬০২ হি.)) ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন সামরিক সেনাপতি। তিনি ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে নদীয়া ও পরবর্তীকালে লক্ষ্মণাবতী দখল করেন এবং বাংলায় মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর বাংলা বিজয় এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা খিলজি আমিরদের অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, (অধ্যাপক, বিশ্বভারতী), বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮) (কলিকাতা: ভারতীয় বুক স্টল, ৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, আদ্যন্ত সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ৪৮৪।

আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৫৬।

আল কুরআন, সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৯০; সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত ৩৯-৪০।